সামাজিক বৈষম্য

কামরুন-নাহার-মুকুল

সামাজিক বৈষম্য সমাজের একটি বাস্তব রূপ। বিশ্বের প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় কোনো না কোনোভাবে সামাজিক বৈষম্য বিদ্যমান। সামাজিক বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা কল্পনাও করা যায় না। তবে উন্নত ও অনুন্নত দেশভেদে সামাজিক বৈষম্যের তারতম্য রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক বৈষম্যের তীব্রতা মারাত্মক। মূলত বৈষম্য শব্দটি সাধারণত বিভিন্ন মানুষের মধ্যে অসম প্রাপ্তির পার্থক্য নির্দেশ করে। বৈষম্যের বিভিন্ন রূপ আছে। সম্পদের বৈষম্য , চিকিৎসা ও দায়িত্বের বৈষম্য, রাজনৈতিক বৈষম্য, জীবন বৈষম্য এবং সদস্যপদ বৈষম্য। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য জাতিগত বৈষম্য, জেন্ডার বৈষম্য এবং সামাজিক অবস্থানের অন্যান্য রূপের সাথে যুক্ত এবং এই রূপগুলো দুর্নীতির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। যখন একটি সমাজের মধ্যে সম্পদগুলো অসমভাবে বিতরণ করা হয় তখনই সামাজিক বৈষম্য ঘটে। সামাজিক বৈষম্যের দৈত্যটাকে কেউ পরাভূত করতে পারে না। তবে ইতিহাসের পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষ ক্রমশ সচেতন হয়েছে, নিয়মকে নিজের সবল হাতে ভেঙ্গে দিয়েছে, গুড়িয়ে দিয়েছে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে প্রত্যেকেই একে অন্যের থেকে আলাদা। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের মত হয় না। আমরা সহজেই একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক করে ফেলি। এ বিবেচনা অনুসারে কাউকে দক্ষ, কাউকে অদক্ষ,ভালো-মন্দ ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করে থাকি। এ ধরনের শ্রেণিকরণকে সামাজিক বিভাজন বলা হয়। সমাজে আরেক ধরনের সামাজিক শ্রেণিকরণ রয়েছে। ব্যক্তির আর্থিক সক্ষমতা, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, জন্মসূত্রে পাওয়া পরিচিতি ও সম্মান ইত্যাদির ভিত্তিতে পদমর্যাদা তৈরি হয়। বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে সৃষ্ট পদমর্যাদার নিরিখে আমরা সমাজের মানুষকে স্তরে স্তরে বিন্যাস করি একেই আমরা সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে থাকি।।

সামাজিক বৈচিত্র্য, বিভাজন ও স্তরবিন্যাস অনেকটা প্রকৃতির নিয়মের মতোই সত্য। মানব সমাজের কথাই ধরা যাক। শারীরিক সৌন্দর্য, অবয়ব, বুদ্ধিমত্তা, নৈতিকতার ধারণা, দর্শন, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা, ধর্মীয় অনুরাগ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিচারে মানুষ একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের অধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তবে পরবর্তীকালে কাঙ্ক্ষিত ফল হয়নি। উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে বৈষম্য বেড়েছে। সম্পদের সঠিক বণ্টন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় রীতিমতো ব্যর্থতা লক্ষ করা গেছে। গত এক দশকে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য আশ্চর্যজনক ভাবে বেড়েছে একইসাথে সাধারণ মানুষ ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকট ও ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির কারণে বেশিরভাগ মানুষ দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। ব্যাংকগুলোতে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জেন্ডার সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট নারী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশ করে। সামাজিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে জেন্ডার বেশ প্রভাববিস্তার করেছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যা কিছু বর্তমান তার সবকিছু নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টার ফল। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা বরাবরই পুরুষশাসিত। এজন্য নারীদের তুলনায় পুরুষরা অধিক সামাজিক ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করে। পুরুষরা অধিক শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী বলে মাঠে-ময়দানে, কলে-কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনার কাজ করে। নারীদের জন্য সমাজ স্বীকৃত কাজ হচ্ছে অন্তঃপুরে থেকে স্বামীর সেবা-যত্ন, সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন, পরিবারে সকলের জন্য রান্না-বান্না করা। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী মার্কস ও এঞ্জেলস সর্বপ্রথম লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যকে বিশ্লেষণ করেছেন। যুগ যুগ ধরে নারীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত হয়ে বরাবরই পিছিয়ে থেকেছে। আজও তাদের গৃহস্থালি কর্মের অর্থনৈতিক স্বীকৃতি মেলেনি। ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের গৃহস্থালি পর্যায়ে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য রয়ে গেছে। যথেষ্ট মেধা থাকা সত্ত্বেও অনেক নারী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না আবার যোগ্যতা থাকলেও অফিস-আদালতে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয় না। নারী প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সমান বা অধিক থাকা সত্ত্বেও পুরুষ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। একই কাজ এবং অভিজ্ঞতার জন্য একজন পুরুষ কর্মীকে বেশি বেতন দেওয়া হয় কিন্তু একজন মহিলা কর্মীকে কম বেতন দেওয়া হয়। নারীদের সঙ্গে হওয়া বৈষম্যের কারণে নারীরা পিছিয়ে পড়ে এবং সমাজের অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

কর্মক্ষেত্রে একজন কর্মী অন্যদের তুলনায় কম যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা থাকার পরও শুধু কর্তৃপক্ষের প্রিয় হওয়ার কারণে পদোন্নতি পেয়ে যায় এবং যোগ্য কর্মী সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা পরিচিতি থাকার কারণেও যার যোগ্যতা অন্য প্রার্থীর তুলনায় কম তাকেই বেছে নেয়া হয়। শিক্ষা জীবন বদলানোর জাদুকরী এক অনুষঙ্গ। সেখানেও

বৈষম্য বিরাজমান। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কতিপয় শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং তাদেরকে সবসময় ভালো নম্বর দেন এতে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা সমানভাবে পরিশ্রম করলেও অবমূল্যায়নের শিকার হন। পরীক্ষার ফলাফলেও বৈষম্য দেখা যায়। ব্যক্তিগত পছন্দের শিক্ষার্থীটির উত্তর অন্যদের তুলনায় দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষক তাকে বেশি নম্বর দেন। আবার ধনী পরিবারের সন্তানেরা আর্থিক সামর্থ্য থাকায় বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেয়। নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা এখানেও বৈষম্যের শিকার হ। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বৈষম্য দেখা যায়। একই অপরাধ করে কেউ দায়মুক্তি পায় আবার কেউ কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হয়। সামাজিক বৈষম্যের প্রকটভাবে লক্ষ করা যায় হাসপাতালগুলোতে। ধনী রোগীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং দরিদ্র রোগীদের উপেক্ষা করা হয়।

বাংলাদেশের সমাজ জীবনে নৃগোষ্ঠীগত সামাজিক বৈষম্য এমন একটি প্রত্যয়, যার কারণে সমাজে বসবাস করেও সবাই একই মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত। ইচ্ছা করলেই এই সামাজিক বৈষম্যকে দূর করা সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণ, কুমোর, নাপিত, ধোপা, দর্জি, চামার, মেথর, বানিয়া এবং দলিত হরিজন ছাড়াও বাগদি, বাজনদার, বেহারা, হাজা, জেলে, কায়পুত্র, রবিদাস বা ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। অনেকে দলিত জনগোষ্ঠীর কাজগুলোকে ছোট ও মর্যাদাহানিকর হিসেবে বিবেচনা করে থাকে অথচ সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি কাজগুলো তারা সম্পন্ন করছেন।

অর্থনীতির এক নীরব ঘাতক উচ্চ মূল্যস্ফীতি। মূল্যস্ফীতির ফলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরো তীব্রতর হয় যা সমাজকে অস্থিতিশীল করে। সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে মানুষের জীবনযাত্রায় এবং সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের সম্পদের বিভাজন উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এতে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা লাভবান হন। জাতিগত, ধর্মীয়, জেন্ডারভিত্তিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য আজও বাংলাদেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। এটি শুধু সামাজিক পরিসরে সমস্যার সৃষ্টি করছে তা নয় বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলোকে প্রভাবিত করে। কোনো অজুহাতেই কারো প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী, দলিত-হরিজন, প্রতিবন্ধী, হিজড়াদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে বৈষম্য, অধিকার লঙ্ঘন, অসম্মান, টিটকারি, ভর্ৎসনা ও হাসাহাসি। সকলের অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের অংশ হিসেবে হিজড়াদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে এই জনগোষ্ঠীকে ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয় বস্তিগুলো। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের উর্বরভূমি এসব বস্তি। উল্লেখ্য, এটি শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রত্যক্ষ ফল। বস্তির অস্তিত্ব ও তার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সমাজ জীবনকে ব্যাপক মাত্রায় কলুষিত করে। বিভিন্ন শিল্পকারখানা যেমন গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, খাদ্য ও পানীয়, মেটাল, জাহাজ ভাঙ্গা, নির্মাণ ইত্যাদিতে কর্মরত হাজারো শ্রমিক এবং তাদের পরিবার বস্তির অরক্ষিত পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে।।নগর সমাজব্যবস্থায় আয়ভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যও প্রকট। সভ্যতা ও আধুনিকতার বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেও 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' বাক্যটি যেন আমরা ভুলে বসে আছি। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অগ্রগতির মাধ্যমে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় বিকশিত করার সুযোগ সৃষ্টি করে জীবনমান উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজে বৈষম্য ও দারিদ্র্য দূর করতে হবে। পশ্চাৎপদ মানসিকতার কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি নষ্ট ও সমাজে দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। এতে সামাজিক মেলবন্ধন ও যোগাযোগে বাঁধা সৃষ্টির সুযোগ উন্মোচিত হয়। মানব সমাজের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে অবশ্যই জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে হবে।

বাংলাদেশের মানুষের চাহিদা খুব সীমিত। মানুষের মনোজগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আনয়নে ব্যর্থ হলে শুধু আইন প্রণয়ন করে কোনো সংকট মোকাবিলা সম্ভব হবে না। বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের জন্য ন্যায়বিচার, সমতা, মানবাধিকারের গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক বৈষম্য দূর হলে রাষ্ট্রকাঠামো আরও মজবুত ও শক্তিশালী হবে। তরুণ প্রজন্ম বারংবার আন্দোলন-প্রতিবাদ করেই বড় হচ্ছে। সম্প্রতি সরকারি চাকরিতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনটি সফল গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হওয়ার অন্যতম কারণ সমাজের সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও সমর্থন। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রতিটি খাতের দুর্নীতি দূর করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার কোনো বিকল্প নেই।

#

পিআইডি ফিচার